তেহট্ট সরকারি মহাবিদ্যালয়

বার্ষিক পত্রিকা

ধনধান্য

শিক্ষাবর্ষ ২০১৮-২০১৯

২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষের কিছু মুহূর্ত

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৮-২০১৯

এন.এস.এস. ইউনিটের সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ আন্দোলন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে প্রধান বক্তার ভাষণ - ২০১৯

প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন ২০১৯

বৃক্ষরোপণ উৎসব

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সমাবেশ

ধনধান্য

তৃতীয় সংকলন ২০১৮-২০১৯

তেহট্ট সরকারি মহাবিদ্যালয়
তেহট্ট, নদীয়া

প্রাধান্য

তৃতীয় সংকলন ২০১৮-২০১৯

প্রকাশক :
ড. শিবশংকর পাল, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ

সত্ত্বাধিকারী :
শিবশংকর পাল

প্রকাশকাল :
২৮শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৯

প্রচ্ছদ : কলেজ বাগানের ছবি

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও নামাঙ্কন :
ড. শিবশংকর পাল

বর্ণ সংস্থাপনে :
কৌশিক দাস

সম্পাদক :
শাশ্বত কুশারী
নীতীশ ঘোষ

সুচিপত্র

- সম্পাদকীয় ২
- শুভেচ্ছা ৩
- সর্বশিক্ষা অভিযান – রিজু মণ্ডল ৫
- যুবশ্রী – সুকেশ বিশ্বাস ৫
- অচেনা বন্ধু – সুপ্রভা মণ্ডল ৬
- ধনীর অহংকার – বাবর সেখ ৭
- মা – আয়েশা সিদ্দিকা খাতুন ৭
- Rain – Moupriya Sarkar ৮
- বিশ্বকবি – বিকি প্রামাণিক ৮
- একগুচ্ছ কবিতা – অক্ষয় বিশ্বাস ৯
- Braindrain in 21st Century – Banashree Sarkar ১০
- কাশ্মীর সমস্যা : ৩৭০ ধারা ও ভারত পাকিস্তান সম্পর্ক – সুমন্ত হালদার ১২
- শিক্ষক দিবস – রাকেশ হালদার ১৭
- নতুন জীবন – প্রিয়া মণ্ডল ১৭
- বিজ্ঞান ও ধর্ম – কৃষ্ণকান্তি হালদার ১৮
- স্বপ্নপূরণের দেশ – আদুরী বিশ্বাস ২১
- ব্যর্থ পাখি – সুমন মণ্ডল ২২
- দাঙ্গাবাজ – জাহির মণ্ডল ২২
- একগুচ্ছ কবিতা – মুজাহিদ সেখ ২৩
- একগুচ্ছ কবিতা – মৌমিতা হালদার ২৪

অঙ্কন বিভাগ
- ঐক্য – শুভ বিশ্বাস তৃতীয় প্রচ্ছদ
- Black & lovely – বৃষ্টি বিশ্বাস তৃতীয় প্রচ্ছদ
- রামসীতা – অনিন্দিতা বিশ্বাস তৃতীয় প্রচ্ছদ
- দৃষ্টি – সুস্মিতা ঘোষ তৃতীয় প্রচ্ছদ

Editorial

It gives me immense pleasure to introduce you - through this little endeavour of Government General Degree College at Tehatta - to this diverse collection of imaginative outpourings. This piece of publication brings together the young and the mature together; and represents the spirit that the college tries to inculcate among everybody associated with it. The works, as one may notice, celebrate humanity in all its various manifestation and sings the songs of the downtrodden and the disenfranchised. This edition, the third, of *Dhanadhanyo* also symbolises what this country should stand for – unity in diversity. I understand that many of the works published in this volume are not masterly literary, artistic endeavours but it's the effort of the students, who have laid their heart and soul, that has been encouraged, and it may be hoped that this spirit will be recognised appreciated by the readers.

We understand that poetry runs through the veins of Tehatta; literally. The languid and eternal movement of Jalangi is nothing but poetic. The lush greenery, the yellow fields are inspiration enough and can spur the imagination of those those who are in dearth of poetry as well. This volume shows that that the students are not in dearth of imaginative talent and they will be encouraged more to express themselves. While the honest poetic expressions encourage us, the scholarly bent of mind seen in some non-fictional works is also encouraging and illuminating.

We have seen time and again that our students are brilliant with paint and paper. The paintings reiterate our belief and encourage us to present this to the world in whatever way we can, and this is precisely what we have done in this volume. Not only do the pictures reveal skilled artists but also allow us to peep into the artists' mind and it fills us with immense pride to train these minds.

Editors
Saswata Kusari
Nitish Ghosh

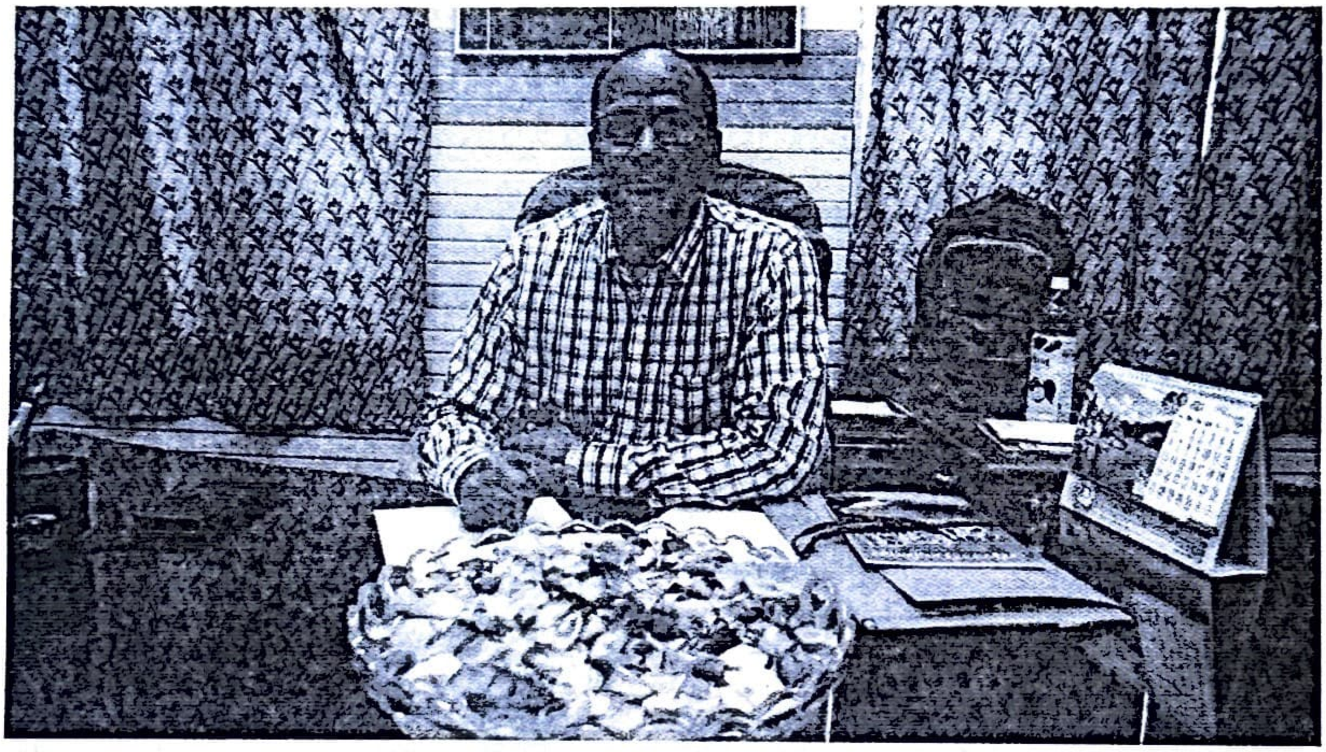

ধর্মীয় বিভাজন, জাতীয়তাবাদ ও রবীন্দ্রনাথ

খুব দুঃসময়ের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি আমরা। নানা টানাপোড়েন অন্তর্ঘাত ও অস্থিরতা দেশের মানুষের স্বস্তিহীন যাপনকে আরও সংকটের আবর্তে টেনে আনছে। কেবল মাত্র নির্বাচনী সাফল্যের পিছনে ছুটতে গিয়ে দেশের নেতারা এ দেশের নাগরিকদের সামনে যে চিন্তাজনক নৈরাশ্যের চিত্র নির্মাণ করে চলেছেন তা এক কথায় অত্যন্ত দুঃখজনক। আমরা যাঁরা জ্ঞানার্জনকারী ও তার সহায়ক হিসেবে কাজ করি, তাঁদের অত্যন্ত সহিষ্ণু হয়ে এই কথাটা বুঝে নিতে হবে যে, সমঝোতা ও সংঘাত – সত্যসন্ধানের এই দুটো পথের যে কোনো একটা আমাদের বেছে নিতে হবে। কোপার্নিকাস, গ্যালিলেও, আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সকল মনীষীর জীবনের মর্মমূলে এই বার্তাটি রয়েছে যে, সত্যসন্ধানের জন্য আর যাইহোক আপস করা চলে না। জীবনমূল্যের লড়াইয়েই একমাত্র সত্য অর্জন সম্ভব। সংঘাতই সত্য অর্জনের একমাত্র উপায়। সংঘাত বলতে এখানে আমরা বুঝে নেবো সেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যা আমাদের সত্যকে জানার ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

ভারতবর্ষের সামাজিক চরিত্রের মধ্যে বহু সমন্বয় রয়েছে; নানা বিবিধতা রয়েছে; রয়েছে আপাত বিরোধী নানা উপকরণ ও সমিধ। এ দেশে উপাস্য ও উপাসকের সম্বন্ধের মধ্যে যে বৈচিত্র রয়েছে তা পৃথিবীর খুব কম দেশেই দেখা যায়। তা সত্ত্বেও এ দেশ তার ধর্মের ও মর্মের মিলনী বার্তাটি কোথাও গোপন করেনি। তাই এ দেশে জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেম বা রাষ্ট্রভাবনা কখনই একপেশে বা একটেরে হয়ে ওঠেনি। কোনো কোনো মহল থেকে দেশপ্রেমের যে একচক্ষু চেহারাটি তুলে ধরা হচ্ছে তা কখনই সত্যের প্রকৃত রূপ নয়; বরং তাকে বিকৃত করার একটি অপচেষ্টা মাত্র। এমন আচরণ ও এবং তাকে মান্য করার জন্য দেশের সকল নাগরিকের উপর তা চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়াস অবশ্যই নিন্দনীয়; অপরাধ তুল্য পদক্ষেপ বলেই মনে হয়। ধর্ম ও ধর্মাচরণ একান্তই ব্যক্তিগত ও ঘরের বিষয়। আর রাজনীতি হলো আমাদের ঘরের বাইরের শক্তিকে জাগিয়ে তোলা, যা

দেশের ভেতরকার সামঞ্জস্যের অভাবগুলিকে দূর করার পথনির্মাণ। এই দুইয়ের মধ্যে একটি স্পষ্ট কিন্তু স্পর্শকাতর সীমারেখা আছে। তাকে লঙ্ঘন করলে দেশের মর্মে আঘাত লাগে। ধর্ম ও রাজনীতি – এই দুটি ক্ষেত্রই তৌল ও মৌল এবং বিকট স্বভাবের। সেই বিকটকে প্রকট করলে সে ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের মতো স্রষ্টাকেও আঘাত করে। এই কথাটা যেন আমরা ভুলে না যাই। বরং উভয়ক্ষেত্রটি যত বেশি মনুষ্যত্ব ও মানবতায় পূর্ণ হবে তত বেশি করে আমাদের রাজনীতি ও ধর্মের পরিসরটি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে। মৌলবাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম করতে হলে মুক্তবুদ্ধির চর্চা করাটাই আমাদের প্রধান দায়িত্ব। বিশেষ করে ভারতের মতো বৈচিত্র্যে পূর্ণ দেশে মৌলবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে গেলে আমাদের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার কিন্তু রবীন্দ্রনাথ।

আমাদের জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের মধ্যে বেশ কিছু ভেজাল ও একঘেয়েমি রয়েছে। রয়েছে যুক্তিহীন অত্যুগ্র উৎসাহ। এই মানসিকতা অন্ধতাকে ডেকে আনে, প্রশ্রয় দেয়, এবং বিষবৃক্ষের বিস্তার ঘটায়। রবীন্দ্রনাথ নানা সময়ে এই একপেশে একচক্ষু জাতীয়তাবাদের বিপদের দিকটি তুলে ধরে আমাদের সচেতন করতে চেয়েছেন। কিন্তু চোরা কখনও যুক্তির কথা শোনেনি, শোনেও না। তাই আজ আবার সেই বিকটের থাবা নানা বাহানায় প্রকট হতে শুরু করেছে। এই সংকটকালে তাই আবার আমাদের রবীন্দ্রচর্চায় আন্তরিকভাবে নিয়োজিত হতে হবে।

আর্নেস্ট রেনাঁ-র লেখা 'Nationalism' (১৮৮২) বইটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল। এই গ্রন্থটি পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি 'নেশন কী' নামের একটি প্রবন্ধ লেখেন। পরে এটি 'আত্মশক্তি'তে অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯১৬ সালে জাপান ও আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথ তিনটি ভাষণ দেন। এই তিনটি ভাষণ নিয়ে প্রকাশিত হয় 'Nationalism' নামে একটি ইংরেজি বই। এই বইতে তিনি ইউরোপের শেখানো 'নেশন-পূজার হিড়িক'কে রাজনীতির 'বৃষ-লড়াই' বলে চিহ্নিত করেছেন। 'ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদ' শীর্ষক ভাষণে বলেছেন, 'আমি কোনো এক বিশেষ 'নেশন' -এর বিরুদ্ধে নই। আমি সাধারণভাবে 'নেশন' ধারণাটিই বিরুদ্ধে। 'নেশন'-এর অর্থ কী? এটা এক জনগোষ্ঠীর সংগঠিত বা সংবদ্ধ ক্ষমতা। এই সাংগঠনিক ক্ষমতা বা জোর জনগোষ্ঠীকে অবিচ্ছিন্নভাবে শক্তিমান ও দক্ষতাসম্পন্ন হয়ে উঠতে সাহায্য করে। কিন্তু শক্তি ও দক্ষতা নির্মাণের জন্য এই কষ্টসাধ্য প্রচেষ্টা মানুষের প্রকৃতির উন্নতমানের প্রবৃত্তি যেমন, তেমন তার সৃষ্টিশীলতা ও আত্মদান তার ব্যক্তিত্ব থেকে দূরে হঠিয়ে দেয়। কারণ মানুষের ত্যাগের ক্ষমতা তার নৈতিক সত্তা থেকে সরে যায় এবং সাংগঠনিকতার দিকে চলে আসে– যে সংগঠনের ধারণা একান্ত যান্ত্রিক। অথচ এই যান্ত্রিকতার মধ্যেই তার নৈতিক উল্লাসের পরিতৃপ্তি ঘটে যা মানবিকতার পক্ষে বিপজ্জনক।"

রবীন্দ্রনাথ আরও বললেন, " 'ন্যাশনালিজম' এক অতিশয় ক্ষতিকর ধারণা। এটা হলো সেই বিশেষ বস্তু যা বহু বছর ধরে ভারতবর্ষের যাবতীয় দুর্বিপাকের মূলে রয়েছে। এবং যেহেতু আমরা এমন এক 'নেশন' দ্বারা শাস্তি ও অবদমিত হচ্ছি যার দৃষ্টিভঙ্গি মূলত রাজনৈতিক।" *[জাতীয়তাবাদ, রবীন্দ্রনাথ, অনুবাদঃ অশোককুমার মুখোপাধ্যায় ও কৃত্যপ্রিয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১২]*

সম্প্রতি আমরা যে সংকট চোখের সামনে ঘনিয়ে উঠতে দেখছি, তাকে ঠেকাতে হলে ধর্মাচরণ বা উগ্র দেশপ্রেম নয়, রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করাটাই হবে সঠিক পদক্ষেপ। শস্ত্র সহ ধর্মীয় মিছিলের চেয়ে অনেক শক্তিমান রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয়তা ভাবনা। এর থেকে বড় অস্ত্রমিছিল আর হতে পারে না। এই অস্ত্রে শাণ দিলেই আমরা নিজেদের রক্ষা করতে পারব।।

ড. শিবশংকর পাল
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ

সর্বশিক্ষা অভিযান

রিজু মণ্ডল
বি.এ. প্রথম বর্ষ, ইতিহাস বিভাগ

শিক্ষা সবার জন্য। প্রতিটি দেশের প্রতিটি নাগরিকের শিক্ষার অধিকার হল সংবিধান স্বীকৃত অধিকার। শিক্ষার আইন অধিকার ২০০৯ অনুসারে এদেশের নাগরিক প্রতিটি শিশু বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার আওতাভুক্ত হয়েছে। বিশেষত যে দেশের কোটি কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে, যারা দুবেলা দুমুঠো খাবার পায় না, সেই দেশে এমন আইন না হলে বহু সংখ্যক মানুষ শিক্ষার মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে। দারিদ্র্য আর অজ্ঞানতা থেকে অল্প বয়সে বিয়ে, নারী পাচার প্রভৃতি ঘটনা ঘটতে থাকে। সেইজন্যই 'কন্যাশ্রী', 'যুবশ্রী' ইত্যাদি প্রকল্প ঘিরে মানুষের মধ্যেও একটা সাড়া পড়েছে। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার প্রতি অভাবী অভিভাবকদের আগ্রহ অনেক বেড়েছে।

শিশুশ্রম প্রথা এদেশের শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো অভিশাপ। শিক্ষার অধিকার আইন সম্পূর্ণ সার্থক এবং অর্থবহ হয়ে উঠবে যদি এই প্রথা চিরতরে বন্ধ হয়। ভারতের সর্বস্তরের শিশু স্কুলের আঙিনায় এসে খেলায় পড়ায় মেতে উঠলে তবেই সবার জন্য শিক্ষা বাস্তবায়িত হবে।

সেদিন প্রতিটি শিশুর মুক্তির স্বপ্ন সফল হবে।

যুবশ্রী

সুকেশ বিশ্বাস
বি.এ. প্রথম বর্ষ, ইতিহাস বিভাগ

'যুবশ্রী' যখন সাথে থাকবে
তখন তোমরা কেন থামবে?
সবাই যখন 'যুবশ্রী' প্রকল্পে দেবে যোগ
ছেলেরা আর পাবে না অশান্তি ভোগ।
১৮ বছর বয়স হলে পাবে 'যুবশ্রী,'
চাকরী করার পূর্বে থাকবে এই প্রকল্পটি।
সরকার যখন দিয়েছে এত বড়ো সুযোগ
তবে, কেন ডেকে আনো নিজের দুর্ভোগ?
তাই বলি ১৮ বছরের পূর্বে পড়া ছেড়ো না;
তাহলে তোমার কপালে কষ্টের সীমা থাকবে না
নানান চাপে যদি ছাড়তে হয় পড়াশোনা?
সরকারকে জানাও তবে সরাসরি গিয়ে।
নিজের স্বপ্ন যদি পূরণ করতে চাও
'যুবশ্রী'তে তবে তোমরা এবার যোগ দাও।
ছেলেরা তোমরা পেয়ো না ভয়
'যুবশ্রী' প্রকল্প একদম-ই মিথ্যা নয়।।

অচেনা বন্ধু

সুপ্রভা মণ্ডল
বি.এ. প্রথম বর্ষ, বাংলা বিভাগ

সেদিন রাতে টিউশন শেষ করে বাড়ি ফিরছিলাম। পথে চলতে চলতে মাঝপথে কেমন যেন হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম, কিন্তু কেন যে এমন হল? এর আগে তো অনেকবার এই অন্ধকার রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরেছি কই কখনও তো এমন হয়নি। আসলে মনে হয় আমি কিছু হারাতে বসেছি, এতদিন আমি যাকে আপন বলে জানতাম সে আমার কেও না। আমি শুধু তার বন্ধু। আচ্ছা আমি কি শুধুই তার বন্ধু। তার প্রতি আমার কি সামান্যতম অধিকারটুকুও নেই। আমি এতদিন শিমূল ফুলের সৌন্দর্যের দিকে ছুটছিলাম, আসলে আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে শিমূল ফুল দেখতেই সুন্দর কিন্তু কোনো কাজে লাগে না। সন্ধ্যাবেলায় বৃষ্টির পর পথের সব ছোটো বড়ো গর্তই ভরাট হয়ে গিয়েছিল, তারপর চাঁদের আলো পড়ে সব এক করে দিয়েছিল। আর সেই পথে হাঁটতে গিয়ে পা গিয়ে পড়ল সেই গর্তে। চাঁদের আলোর তো পৃথিবীকে সমান করার ক্ষমতা আছে, কিন্তু আমার কি কিছুই নেই? আসলে সবাইকে আমি আমার আপন বলে ভাবি আর সেখানেই ভুল করে বসি। কিন্তু কেন জানিনা সবাই আমাকে দূরে সরিয়ে দেয়। এই দোষটা কি সত্যিই শুধু আমার? মনে হয় আমি তাদের সবার মনের মতো হতে পারি না। চন্দ্রালোকিত রাত যতই সুন্দর হোক না কেন সেই কৃতিত্ব একা চাঁদের নয় সবটাই কিন্তু সূর্যের। কিন্তু সূর্যের কথা কে মনে রাখে। যার জন্য আমি সব করি আসলে সে আমার কেউ না। এতদিন আমি কাঁচকে হীরক বলে মনে করেছিলাম। কিন্তু আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে হীরক ও কাঁচের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। শুধু এই ক্ষেত্রেই নয় আরও অনেক ক্ষেত্রেই আমাকে একইরকম হতাশায় পড়তে হয়। আমি যখনই কোনো জায়গায় যাওয়ার জন্য বাসস্ট্যান্ডে আসি তখনই বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছানোর ঠিক ১ মিনিট আগে বাস চলে যায়। পিছনে ছুটে কোনো লাভ হয় না। অপেক্ষা করতেই হয় আরেকটি বাসের জন্য। কিন্তু আমার মনে হয় আমি কি সারাজীবন পিছনেই পড়ে থাকব? আমি কি পারব আমার লক্ষ্যে পৌঁছাতে? জীবনে যাদের সুখের চিহ্ন নেই তখন তাদের সুখের কামনা না করাই ভালো। আসলে যাদের জীবনে ভুলে পরিপূর্ণ তাদের দুঃখ পাওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সব মানুষই তো ....।

ধনীর অহংকার

বাবর সেখ
তৃতীয় বর্ষ, ইতিহাস বিভাগ

যাদের আছে এই বিশ্বে অনেক সম্পদ,
তাদের মধ্যে অনেকের আছে অহংকার।
কেন কর তোমরা অ্যাতো অহংকার।
হে ধনী তুমি কী জান এই অহংকারে কী আছে,
আছে দুঃখ আছে কষ্ট আছে অনেক বেদনা।
কেনো তোমাদের রক্তচক্ষু ভরা দৃষ্টি,
সেই দরিদ্র, অবহেলিত, নিপীড়িত মানুষের প্রতি।
হে অহংকারী ধনী মানব তুমি কী ভুলে গেছ,
অর্থের মোহে মানবতা কী ভালোবাসা কী।
হে অহংকারি ধনী তুমি কী ভুলে গেলে,
তোমার খেত, আপিস, কারখানা, অট্টালিকা পরিচালনা করে
এই খেটে খাওয়া অসহায় মানুষগুলি।
কেনো জানো, দুই বেলা দুই মুঠো অন্নের তাড়নায়
দেখিলাম সেই দিন তোমার গরীবের প্রতি ভালোবাসা,
আসিল এক বস্তির ময়ে ধরিল তোমার পা
বলিল বাবু দে না দুই হাজার টাকা।
পোলাটার বড় অসুখ ডাক্তার দেখাব, ওসুদ কিনিব
আর তুমি তারে দিলে এক লাথি বলিলে চল ভাগ
দুই দিন পর শুনিলাম পোলাটা নাকি গিয়েছে মারা।
তাই হে অহংকারী ধনী মানব আজ তোমায় বলি,
যেই দিন তুমি যাবে এই বিশ্ব ছেড়ে চলিয়া
যাবে কী তোমার সাথে এই ধন সম্পদ।
ইতিহাস আজো সাক্ষী, অহংকারে রাজা একদিন হয়েছে
পথের ফকির, সর্বহারা
তাই বলি আর অহংকারী কঠোর হয়ো না।
অহংকার করিলে যে সব যাবে যে চলিয়া
এইকথা আমার নয় স্বয়ং মহান খোদার।

মা

আয়েষা সিদ্দিকা খাতুন
প্রথম বর্ষ, ইংরাজী বিভাগ

তোমার স্মৃতি মা গো
হয় না ইতি কেন?
দিনে দিনে বেড়ে বেড়ে
হয় যে দ্বিগুণ।
মা... মাগো... মা...
তোমার স্মৃতি মা গো –
হয় না ইতি কেন
কত দিন কেটে গেল
দেখি না তোমায়!
কত রাত বয়ে গেল!
শ্রাবণ ধারা।
চারিদিকে আমার
শুধুই আঁধার
ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে
তোমার শিশু
মা... মাগো... মা...
তোমার স্মৃতি মা গো –
হয় না ইতি কেন?
ঘরে ফিরে আসতে,
খোকা বলে ডাকতে।
দু হাতে বুকের মাঝে,
জড়িয়ে রাখতে।
মায়ার আঁচলখানি,
ডাক দিয়ে যায়
বুকের ভিতরে জানি।
দহনের আগুন
মা... মাগো... মা...
তোমার স্মৃতি মাগো
হয় না ইতি কেন?

Rain

Moupriya Sarkar
1st Year, English Dept.

Rain, Rain, Rain
Be loved ever come.
What you say ?
Why you silent ?
talk to me –
when you come,
in the world
then you moody
And I see far away
And I think you alive.
you are strength motion full,
But I am dead,
as a human being
you are the part of nature.
You stay in heaven
And you are the hero
of the world
But I have ruined myself.
Rain Rain Rain
Be loved ever came.

বিশ্বকবি

বিকি প্রামানিক
প্রথম বর্ষ, ইংরাজি বিভাগ

ওগো রবি
তুমি শুধু আমাদেরই নও
তুমি বিশ্বকবি
আবাল - বৃদ্ধ - বণিতা,
সকলের তরে তুমি পূজিত।
এই বিশ্ব তোমার পদচরণে নত।
১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ
জন্মেছিলে ঠাকুর পরিবারে,
মায়ের কোল আলো করে
সেদিন হয়তো বুঝেছিল মায়ে
আজকের এই শিশু
রয়ে যাবে বিশ্বের দরবারে
জ্যোতিষ্কের মতো উজ্জ্বল হয়ে।।

অক্ষয় বিশ্বাস
বি.এ. তৃতীয় বর্ষ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান

আমার ঘুড়ি ওড়ানো মাঠ, আমি

পাঁচিল টপকে ছুট
মাঞ্জা দেওয়া সুতো
ঘুড়ি। লাটাই দুই আঙুলের মাঝে
বৃষ্টি ভেজা নরম হাসির ঝিলিক।
সবুজ রোদের গন্ধে ভরা 'কিশলয়'
ঘুড়ি উড়ছে ঘুড়ি উড়ছে ওই 'আকাশটাই'।
ভোঁ কাট্টা হো হো কলরবে মুখরিত
রোদে ভেজা দিনের কথা মনে পড়ে।
এখনো ঘুড়ি ওড়ে বিশাল মাঠে
লক্ষ লক্ষ ঘুড়ি
পাঞ্জা দেওয়া চলছে জোর কদমে
লাটাই আরো শক্ত করে ধরেছে
সবাই চার আঙুলে
বিষণ্ন বিকেল
ধূসর সকালে
সেই উল্লাস
আজ ম্লান রোদের হাসি
ভোঁ কাট্টার সহাস্য পুর
বিষন্নতা মাখা
তবুও ঘুড়ি ওড়াই
আজ ঘুড়ি ওড়ানো
একটি 'তুড়ি'
আমার ঘুড়ি ওড়ানো মাঠ ... আমি..।

রোদের গন্ধ

উজ্জ্বল রোদে ভিজতে নামে সবাই
কেউ ভিজে মুমূর্ষু, ক্রমশ মৃত্যুর পথে
কেউ রোদের গন্ধে ঢেউ তুলে যায়
প্রতিফলনের রোদটাই
তার স্মাইল ও
মাইলস্টোন
জন্ম আকাশকে ছোঁয়
'জন্ম'।

একটি সভ্যতার জন্ম

এ আলো মৃত্যু আনে।
হত্যা করে জন্মচেতনাকে।
প্রতিফলনের মস্থিত আলোয়,
জন্ম জেগে থাকে।
হ্রদে উঠেছে তরঙ্গ,
রহস্য ভেঙে ফেলেছে দূরবীন।
তখন,
আমরা শোধ
করতে পারবো
সেই সভ্যতার ধ্বজা।

অর্ধজীবন্ত লাশ

গিঁট খোলা সব
ইঁট গোলাতে,
জীবাশ্ম কয়লাই
পুড়ে মরে।
তরঙ্গের শেষ শব্দ
রঙিন আলোয় ভাসে।
কিছু অর্ধজীবন্ত লাশ,
নড়ে মধ্যযুগের প্রবল ঝড়ে।
বিন্দু থেকে ঝরছে কালি,
বিন্দুর মুখ এক্সরে করা,
তাই সিন্ধু দর্শন তাপ্পি-তালি।
মুখ দেখে ওরা মুখ দেখাতে
আলো নেই, তাই এল.ই.ডি জ্বালাই।
দু-কাঠি ঠুকে মধ্যরাতে,
সব সুন্দরের গাঁট খুলেছে,
গিঁট পড়েছে সুন্দর গন্ধে।
অনেক সুন্দরই অর্ধজীবন্ত,
জন্ম-মৃত্যু এই দ্বন্দ্বে।

Braindrain in 21st Century

Banashree Sarkar
B.A. English (H) 3rd year

When highly qualified experts like scientists, engineers, doctors migrate from under developed countries, their migration is called 'Braindrain'. This problem is not pecular in India alone. It is being faced almost all the developing countries of the world.

Braindrain results in direct loss to the underdeveloped and poor countries like India who train these experts at a great cost. When these experts migrate to other country that country is benifited because they get services from the experts without having to spend anything on their training.

According to UNO report, 1000 of experts migrate from India to the advanced and rich countries like USA, U.K., Canada, Germany, Australia etc. USA, the richest counrty in the whole world, has been the biggest gainer from the braindrain of India.

But there are a number of factors responsible for braindrain in India. First of all India lacks job opportunities. When, after completing higher studies people do not get any employment in India, they start looking forward to advance countries for jobs.

Secondly, we do not recognise talent in our people, much less offer jobs to them. There are many topper students in India like Hargobind Khurana who couldnot get any job in India. We became aware of his talent only after he left India and became a Nobel Laureate. So many Scientists and engineers are there in that list.

Thirdly, India lacks facilities for advanced research. Most of the students who go abroad for higher research do not turn to India. They are offered lecurative jobs so that they may stay on in advanced countries and give these countries the benefit of their research.

Fourthly, advanced countries like USA, Britain, Çanada and Germany, offers the experts a much higher standard of living than what they can get in developing countries like India. Morever, in advanced countries, one can earn while learning. The stipends in foreign countries are substantial. A frugal Indian living in a foreign can even save something and send it home.

India is endowed with vast natural resources like oil, gas, coal, iron ore, gypsum, diamonds, uranium, platinum etc. There is no doubt that if these natural resources are exploited

in full, India can become one of the developed countries of the world. The Indian experts whom we loose every year, can stay on in India and help in the development and utilisation of natureal resources. Even those experts who have already settled in foreign countries should be lured back to India so that they can help India to become a great country forever in the world.

This problem cannot be solved without the cooperation of the people. The parents of the students should discourage their sons and daughters from going abroad even if they are offered lucrative jobs. Our political leaders should be serious about this problem, and they should set a personal example by preventing their children from going abroad and setting there.

All the doctors, scientists and engineers should realise that they are having some duty in their country. Our country spends crores of money on their training. On becoming experts they should not betray their country by serving foreing countries. They should feel proud for their country.

কাশ্মীর সমস্যা ঃ উৎপত্তি ৩৭০ ধারা ও ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক

সুমন্ত হালদার
বি.এ. তৃতীয় বর্ষ, ইতিহাস বিভাগ

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরকে এক টুকরো অগ্নিকুণ্ড বললেও অত্যুক্তি করা হবে না। কারণ ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে গ্রেট ব্রিটেন ভারতীয় উপমহাদেশ ত্যাগ করে চলে গেলে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপিত হয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতির দ্বি-মেরুকরণ, ঠান্ডা যুদ্ধের পরিবেশ, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক কয়েকটি সমস্যা দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ককে জটিল করে তুলেছিল। দেশভাগ, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভয়ংকর দাঙ্গা, শরণার্থী সমস্যা, সৈনবাহিনী, আমলাতন্ত্র ও কোষাগার ভাগ নিয়ে দুই দেশের মধ্যে তিক্ততা তৈরি হয়েছিল। তবে সব সমস্যাকে ছাড়িয়ে প্রাধান্য পেয়েছিলেন 'কাশ্মীর সমস্যা'।

কাশ্মীর ভারত এবং পাকিস্তানের একদম কেন্দ্রে রয়েছে। যার প্রভাব পড়ছে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে। কাশ্মীর সমস্যা আলোচনা করার পূর্বে এই সমস্যার তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা তুলে ধরা প্রয়োজন। প্রথমত, কাশ্মীর উপত্যকা মূলত মুসলিম জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত ও কাশ্মিরী ভাষাভাষী। তাই ধর্মীয় ও ভাষাগত দিক থেকে এটি স্বতন্ত্র বৃত্তে আবদ্ধ। দ্বিতীয়ত, দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারত ও পাকিস্তান এই দুটি দেশের আত্মপ্রকাশ ঘটলেও কাশ্মীর জনগণের ভাগ্য নির্ধারণে জনমত যাচাই করা হয়নি। অর্থাৎ কাশ্মীর ভারতে থাকবে, কি থাকবে না, পাকিস্থানের সঙ্গে সংযুক্ত হবে, না ভারত পাকিস্তান এই দুইয়ের মধ্যে যুক্ত না হয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হবে – এই বিষয়ে কাশ্মীরের জনগণের রায় নেওয়া হয়নি। তৃতীয়ত, কাশ্মীরে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয়ে পাকিস্তান ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ্যে ও গোপনে প্ররোচনায় লিপ্ত রয়েছে।

কাশ্মীরের দখলদারিত্বের কথা অতি সংক্ষেপে বলা যায় যে, ১৩৩৯ সালে শাহ মীর কাশ্মীরের প্রথম মুসলিম শাসক হিসাবে অধিষ্ঠিত হন এবং শাহ মীর রাজবংশের গোড়াপত্তন করেন। পরবর্তী পাঁচ শতাব্দীব্যাপী কাশ্মীরে মুসলিম শাসন বজায় ছিল। এর মধ্যে মুঘল সম্রাটরা ১৫৮৬ সাল থেকে ১৭৫১ সাল পর্যন্ত এবং আফগান দুরবানী সম্রাটরা ১৭৪৭ থেকে ১৮১৯ সাল পর্যন্ত কাশ্মীর শাসন করেন। ১৮১৯ সালে পাঞ্জাবের শিখ শাসক মহারাজা রঞ্জিত সিং কাশ্মীর জয় করেন। অবশেষে ব্রিটিশরা কাশ্মীর দখল করে প্রিন্সলি স্টেটের মর্যাদায় তা শাসন করেন। কিন্তু অমৃতসরের চুক্তি (১৮০৯ খ্রিঃ) অনুসারে জম্মুর রাজা গুলাব সিংহ অঞ্চলটি ব্রিটিশদের কাছ থেকে ৭৫ লক্ষ টাকায় ক্রয় করেন। এবং সর্বশেষ রাজা ছিলেন হরি সিং।

বর্তমানে কাশ্মীর তিনটি অঞ্চল নিয়ে গঠিত। যথা ঃ কাশ্মীর, গিলগিট এবং জম্মু। এর মধ্যে গিলগিট পুরোপুরি পাকিস্তানের দখলে এবং জম্মু পুরোপুরি ভারতের দখলে। কাশ্মীরে কিছু অংশ ভারতের দখলে রয়েছে। কাশ্মীরের একটি অংশ পাকিস্থানের দখলে যেটি আজাদ কাশ্মীর নামে পরিচিত। বর্তমানে কাশ্মীরে মুসলিম জনসংখ্যা ৯০ শতাংশ ও জম্মু প্রদেশে মুসলিম জনসংখ্যা ৬১ শতাংশ এবং গিলগিটে মুসলিম জনসংখ্যা ৯৯ শতাংশ। ১৯৪১ সালে এই জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৪০ লক্ষ এবং বর্তমানে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ।

১৯৪৭-এর অক্টোবরে যে 'সংযুক্তি সাধনপত্র' ইনস্ট্রুমেন্ট অব অ্যাকসেশন সই হয়েছিল। তাতে জম্মু-কাশ্মীরকে ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে সাময়িকভাবে এক বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়। ১৯৫০ -এর ফেব্রুয়ারিতে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ দু'দেশকেই কাশ্মীর থেকে সৈন্য সরিয়ে নিতে বলে। ভারত চাইল পাকিস্তান আগে সৈন্য সরাক আর পাকিস্থান বলল ন্যাশনাল কনফারেন্স সরকারকে সরানো হোক। কাশ্মীর সমস্যাকে আদৌ রাষ্ট্রসংঘের নিয়ে যাওয়াতে ভুল হয়েছিল বলে ভারত ইতিমধ্যে আফশোস করতে আরম্ভ করেছিল। ১৯৫০-এর জানুয়ারিতে চালু হল ভারতীয় সংবিধান; তাতে কাশ্মীরকে ভারতীয় সংঘের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হলেও কাশ্মীর রাজ্যকে কিছু পরিমাণ স্বশাসনের নিশ্চয়তা দেওয়া হল। ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ নং ধারায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছিল যে রাষ্ট্রপতি, প্রতিরক্ষা, বিদেশনীতি আর

যোগাযোগ ছাড়া অন্য সব ব্যাপারে কাশ্মীর রাজ্যের সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে চলবেন এবং সংবিধানের ৩৫৬ নং ধারা অনুযায়ী পুরোপুরি রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করতে পারবে না ভারত। প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, সাম্প্রতিককালে ২০১৫সালে ডিসেম্বর মাসে বিখ্যাত অভিনেতা ও কাশ্মীরী পন্ডিত অনুপম খের বলেছিলেন ভারতের ৩৭০ নং ধারা বাতিল করা হোক। কারণ কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে ভারত ও পাকিস্তান কিছুই সুবিধা পাচ্ছে না। কাশ্মীরের জনগণ দীর্ঘ ৫০-৬০ বছর ধরে অত্যাচারিত হচ্ছে। তাই ভারত যদি সংবিধানের ৩৭০নং ধারা তুলে নেয় তাহলে হয়তো কাশ্মীর ভারতের অনেক কাছে চলে আসবে। এই মন্তব্যের কারণে তাঁকে নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়েছে ও কিছু মুষ্টিমেয় লোক তীব্র ভাষায় বিরোধিতা করেছেন। ৩৭০ নং ধারায় আরও বলা হয়েছে – কাশ্মীর রাজ্যটিকে তার নিজস্ব গণ-পরিষদ ও নিজস্ব সংবিধান রাখার সদর-ই-রিয়াসৎ নামধারী নিজস্ব রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের এবং নিজস্ব পতাকা রাখার অনুমতি দেওয়া হল। ভারতের সংবিধানের মৌলিক অধিকারের অংশটি কাশ্মীর রাজ্যের প্রতি প্রযুক্ত হবে না। সুপ্রিম কোর্ট, নির্বাচন কমিশন, অডিটর জেনারেল প্রমুখ প্রতিষ্ঠানেরও কোনো এক্তিয়ার রইল না এখানে। তবে ৩৭০ নং ধারায় রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রের সম্পর্ক নিয়েই কেবল বিবেচনা করা হয়েছিল, ইউনিয়নের সঙ্গে কাশ্মীর রাজ্যের সংযুক্তি নিয়ে নয়,সংযুক্তির ব্যাপারটা ছিল চূড়ান্ত।

১৯৫৬ সালে জম্মু-কাশ্মীর গণপরিষদ ভারতের সঙ্গে কাশ্মীর রাজ্যের সংযুক্তি অনুমোদন করল। যতদিন এগিয়েছে, ততই কাশ্মীর রাজ্যের বিশেষ মর্যাদার রীতিমতো অদলবদল করা হয়েছে। সে মর্যাদাকে বিলুপ্ত করা হয়েছে বললেও দোষ হয় না। কাশ্মীর রাজ্যের স্বশাসনের সঙ্গে যেসব বন্দোবস্ত জড়িয়ে ছিল সেগুলো না থাকায় কাশ্মিরীদের একটা বড় অংশ ক্ষুদ্ধ হন, অপরপক্ষে ৩৭০ নং ধারা চালু হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কাশ্মীর রাজ্যের জম্মু অংশে ভারতের সঙ্গে পূর্ণ সংযুক্তির আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। কিন্তু কাশ্মীরের বিষয়ে পুরোপুরি হস্তক্ষেপ বজায় রাখে।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট গৃহীত ভারত স্বাধীনতা আইনে ব্রিটিশ সরকার দেশীয় রাজাদের সার্বভৌমত্ব ফিরিয়ে দিয়েছিল। সব দেশিয় রাজা স্বাধীন ও সার্বভৌম হয়ে যায়। দেশীয় রাজাদের দুটি ডোমিনিয়নের একটিতে যোগ দিতে বলা হয়। অথবা তারা ইচ্ছা করলে স্বাধীন থাকতে পারেন এমন ইঙ্গিত ছিল। কিন্তু ভারত প্রথম থেকেই কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে জাহির করে এসেছে। এর মূল কারণ হল কাশ্মীরের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান, ভারতের নিরাপত্তার স্বার্থে কাশ্মীরের ওপর ভারতের কর্তৃত্ব বজায় রাখা একান্তভাবে জরুরী। এছাড়া ভারত কখনই দ্বিজাতি তত্ত্বে আস্থাশীল নয়, ধর্ম-নিরপেক্ষতা ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্যতম প্রধান ভিত্তি, বহুজাতি ধর্ম-অধ্যুষিত ভারতের ধর্ম নিরপেক্ষ চরিত্র বজায় রাখতে হলে কাশ্মীরের ইসলামীয় আত্মপ্রতিষ্ঠা মেনে নেওয়া যুক্তিগ্রাহ্য নয়। বলা বাহুল্য যে ব্রিটিশরা নাকি বলেছিলেন কাশ্মীর আমাদের হাতে নেই তাই কাশ্মীর সমস্যার স্থায়ী সমাধান আমরা করতে পারবো না। অপর পক্ষে পাকিস্তানে ৯৯ শতাংশ মানুষ মুসলমান বসবাস করে। সুতরাং কাশ্মীর একটি মুসলমান অধ্যুষিত রাজ্য হওয়ায় তারা মনে করে কাশ্মীর পাকিস্তানের সঙ্গে যাওয়া উচিত, তারা আরও মনে করে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে কাশ্মীরে পাকিস্তানের বৈধ অধিকার প্রতিষ্ঠা। কালক্রমে পঞ্চাশের দশকে কাশ্মীর সমস্যায় দু'ধরনের জটিলতা দেখা দেয় কিন্তু বর্তমানে এখনকার পরিস্থিতিতে কাশ্মীরে গণতান্ত্রিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা ভারতের পক্ষে আশঙ্কাজনক হয়ে ওঠে। এই অনুগত রাজনীতিবিদদের দিয়ে জনমতকে সঠিক ভাবে যাচাই না করেই এক কৃত্রিম রাজনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করে। এর পাশাপাশি বিশ্বজনীন ঠান্ডা লড়াই রাজনীতি কাশ্মীরের সমস্যাকে দ্বি-পাক্ষিক বৃত্ত থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির বৃহত্তর পরিমণ্ডলে সংস্থাপন করে। কাশ্মীরকে ভারতের অঙ্গ রূপে সোভিয়েত রাশিয়া মতামত ব্যক্ত করে কিন্তু ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্র পাকিস্তানের স্বপক্ষে মতামত ব্যক্ত করে। শেখ আবদুল্লার সাহস ও চরিত্রবল ছিল অসাধারণ। জনগণ তাঁকে পছন্দও করত। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি ছিলেন স্বৈরাচারী, খামখেয়ালি, আবেগচালিত। তাঁকে ঘিরেই কাশ্মীর সঙ্গে

ভারতের আভ্যন্তরীন সমস্যার সুত্রপাত। কাশ্মীর উপত্যকায় সাম্প্রদায়িক শক্তি চাইত পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্ত হতে। ওদিকে জম্মুর সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ভারতের সঙ্গে পূর্ণ সম্মিলনের দাবি জানাত। দু'দলের চাপে জেরবার হয়ে আবদুল্লা ক্রমে বিচ্ছিন্নতাবাদের দিকে ঘুরে যান। সাম্প্রদায়িক মহলের শক্তিকে, আর ভারতের সেকিউলারিজমের দুর্বলতাকে বাড়িয়ে দেখেন তিনি। কেবলই ভারতের সঙ্গে জম্মু-কাশ্মীরের সংযুক্তির সীমাবদ্ধতা নিয়ে কথা বলতে থাকেন। এমনকি আমেরিকা ও অন্যান্য পশ্চিমী শক্তির সাহায্য নিয়ে কাশ্মীরের স্বাধীনতা অর্জনের কথাও বলেন। ১৯৫৩ সালে জুলাই মাসের মাঝামাঝি নাগাদ প্রকাশ্যে কাশ্মীরের স্বাধীনতা দাবি করলেন আবদুল্লা।

১৯৫০-১৯৫২ এই পর্ব জুড়ে জম্মু-কাশ্মীর বাদে ভারতে বাকি অংশ নতুন সংবিধানের সঙ্গে পরিচিত হল। প্রথম নির্বাচন ও অনুষ্ঠিত হল, কিন্তু জম্মু-কাশ্মীর দু'দিক থেকে অনিশ্চয়তার শিকার হয়ে রইল। একদিকে রাজ্যের সঙ্গে কেন্দ্রের অমীমাংসিত সম্পর্ক, অন্যদিকে মুসলিম প্রধান কাশ্মীর উপত্যকার সঙ্গে হিন্দু প্রধান জম্মু অঞ্চলের ক্রমবর্ধনের সংঘর্ষ।

জানুয়ারিতে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পরিষদের পক্ষ নিয়ে 'ভারতের সঙ্গে পূর্ণমাত্রায় অঙ্গীভূত' হওয়ার জন্য গভীর দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ আবেগ মথিত সংগ্রামের পক্ষ নিয়ে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহওরলাল নেহেরুকে এক দীর্ঘ চিঠি লিখলেন। তাতে নিতান্ত অকারণেই তিনি এতদিনকার অবিভক্ত রাজ্যের যে-অংশটি পাকিস্তানের দখলে আছে তা পুনরুদ্ধার করার একটা চ্যালেঞ্জও ছুড়ে দিলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'ভারত এই ভুখন্ড কী করে ফেরত পাবে? আপনি বরাবরই এই প্রশ্নটা এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু আজ সময় এসেছে, আজ আমরা আপনার কাছে থেকে জানতে চাইব, এ ব্যাপারে ঠিক কী আপনি করতে চাইছেন। আমাদের নিজেদের ভূখণ্ডের এই হারানো অংশটুকু যদি আমরা পুনরুদ্ধার করতে না পারি, তবে সেটা হবে জাতীয় অবমাননা আর অপমানের সামিল।

নেহেরুজি এই খোঁচাটা ধর্তব্যের মধ্যে আনলেন না। প্রজা পরিষদ প্রসঙ্গে তিনি জানালেন, 'তারা সংবিধানের এক অত্যন্ত কঠিন ও জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করতে চাইছে যুদ্ধের পদ্ধতিতে। আবদুল্লা আরও চাঁছাছোলা ভাষায় জবাব দিলেন,তাঁর মতে, 'প্রজা পরিষদ সাম্প্রদায়িক পদ্ধতিতে জোর করে গোটা কাশ্মীর সমস্যার একটা মীমাংসা করার জন্য কৃতসংকল্প।'

পরিশেষে মুখার্জি প্রজা পরিষদের নেতাদের মুক্ত করে দিয়ে কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ নিয়ে এক সভা ডাকবার আবেদন করতে বললেন নেহেরু আর আবদুল্লাকে। তিনি আবার নেহেরুজিকে পাকিস্থানের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য আহ্বান করলেন, দয়া করে বিষয়টাকে পাশ কাটিয়ে যাবেন না, জনসাধারণকে জানতে দিন, কীভাবে এবং কখন আমরা আমাদের প্রিয় ভূখণ্ডের হারানো অংশটুকু ফিরে পাবো?'

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে ১৯৪০-এর দশকের মতো ১৯৫০-এর দশকেও কাশ্মীর উপত্যকায় অশান্তি আর অব্যবস্থা লেগেই রইল। ১৯৪০-এর দশকের অশান্তির মূলে একদিকে ছিল মহারাজার অবিমৃশ্যকারিতা। সময় থাকতে তিনি পাকিস্তান কিংবা ভারত কোনো পক্ষেই যোগ দিলেন না। আর অন্যদিকে ছিল উপজাতীয় হানাদারদের লোভ ও উদগ্রতা। আর ১৯৫০-এর দশকের অশান্তির মূলে ছিল শেখ আবদুল্লার উচ্চাভিলাষ, নেহেরুর অগ্রাহ্যতা আর এস.পি. মুখার্জির উচ্চাকাঙ্খা। এরা রাজনৈতিক বাজির দর চড়ালেন, আর তার চরম বিয়োগান্ত মাসুল দিলেন। এর থেকে বোঝা যায় শেখ আবদুল্লার পাকিস্তানী মনোভাব ভারত তাকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়। এই চরম টানাপোড়নে ভারত পাকিস্তানে অনৈতিক পরিস্থিতি কাশ্মীর সমস্যাকে জটিল থেকে জটিলতর করেছে।

পাকিস্তানের দাবি

১) পাকিস্তান ও ভারত স্বাধীন হয়েছে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে। তাই কাশ্মীর অবশ্যই পাকিস্তানের সাথে থাকবে।

২) কাশ্মীর স্বাধীন থাকবে কিন্তু ভারতের অংশ হতে পারবে না।

৩) মুসলিম দেশ হিসেবে আর এক মুসলিম দেশ কাশ্মীরের সমস্যা সমাধানের অধিকার আছে পাকিস্তানের।

৪) সিমলা চুক্তির মাধ্যমে কাশ্মীরের সমস্যার সমধান হতে পারে না। এটি দ্বিপাক্ষিক বিষয় হতে পারে না। কাশ্মীর সারা বিশ্বের একটি অনুষঙ্গ।

অপর পক্ষে ভারতের দাবি ঃ-

১) ভারত মনে করে কাশ্মীরের শেষ রাজা হরি সিং কাশ্মীরকে ভারতের কাছে দিয়েছে। তাই কাশ্মীর ভারতেরই আমানত।

২) ভারতের জাতীয় নির্বাচনে কাশ্মীরের মানুষও ভোট দেয়। তাই কাশ্মীরে কোনো আলাদা করে নির্বাচনের দরকার নেই।

৩) ১৯৭২ সালে পাকিস্তান সিমলা চুক্তি মেনে নিয়েছে। যার ফলে কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের কথা বলার সুযোগ নেই।

৪) ভারতের দাবী, পাকিস্তান কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদে সহযোগিতা করেছে এজন্য কাশ্মীরের কোনো আলোচনায় পাকিস্তান আসতে পারে না।

এই দুই দেশের দ্বন্দ্বে কাশ্মীর সমস্যার কোনো স্থায়ী সমাধান হয়নি এখনও পাকিস্তান কাশ্মীর সমস্যাকে আন্তর্জাতিকীকরণের চেষ্টা করছে কিন্তু ভারতের সামরিক ও প্রশাসনিক উন্নতির ফলে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে। রাষ্ট্র সংঘের মধ্যস্থতায় দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধবিরতি ঘটে, দুই দেশের অধিকৃত অঞ্চলে মধ্যবর্তী রেখাকে বলা হয় নিয়ন্ত্রণ রেখা (LOC)।

রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে, ভারত ও পাকিস্থান তাদের অধিকৃত অঞ্চল থেকে সৈন্য সরিয়ে নেবে। জণভোটের রায়ে কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে। কিন্তু ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে কাশ্মীরে Jammu Kashmir Liberation Front (JKLF) গঠিত হয়। পাকিস্তান নিজ স্বার্থে এই মুক্তি ফ্রন্টের সশস্ত্র সংগ্রামে সাহায্য করছে, তবে পাকিস্তানের হস্তক্ষেপ মুক্তি ফ্রন্টের কাম্য নয়।

১৯৪৭-এর অক্টোবরে কাশ্মীর ভারতে যোগ দেওয়ার ঠিক পরেই ভারত কাশ্মীরের জনগণের জন্য আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানে একটি গণভোট নেওয়ার প্রস্তাব করেছিল যাতে কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কেবল একটাই শর্ত ছিল ঃ গণভোট হওয়ার আগে পাকিস্থানি সেনা কাশ্মীর ছেড়ে চলে যেতে হবে। ১৯৫৩ সালের শেষ পর্যন্তও ভারত সরকার উপযুক্ত অবস্থায় অনুষ্ঠিত গণভোটের ফলাফল মেনে নিতে রাজি ছিল। কিন্তু গণভোট করা সম্ভব হল না। সৈন্য প্রত্যাহারে রাজি হল না। ১৯৫৩-১৯৫৪ সালে আমেরিকা পাকিস্তানের সঙ্গে কার্যত এক সামরিক মৈত্রী গড়ল। এর ফলে পাকিস্তান শত্রুতা ও 'ঘৃণার নীতি'-র ভিত্তিতে উদ্ধত ও আগ্রাসী মনোভাব দেখানোর মদত পেল।

পট পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এই ৭০ দশক ধরে চারবার বড়ো যুদ্ধ হয়েছে (১৯৪৭, ১৯৬৫, ১৯৭১ ও ১৯৯৯)। দুই দেশ এখন আনবিক অস্ত্রের অধিকারী, কোনো দেশই নিজের অবস্থান থেকে সরে আসতে রাজি নয়। অনেক পর্যবেক্ষক এমন আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, দক্ষিণ এশিয়ায় আনবিক যুদ্ধের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। ভারত পাকিস্তানের অনৈতিক বোধগম্যের পরিস্থিতিগত দ্বন্দ্বের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কাশ্মীরের জনগণের অধিকার, ব্যাহত হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন। কাশ্মীরের পরিস্থিতি এতটা সংকটজনক হয়ে উঠছে ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে চীন-ভারত সংঘর্ষে ও ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে ভারতের যে সংখ্যক সেনার জীবন নাশ হয়েছিল তার তুলনায় বিগত দশ বছরে কাশ্মীরে জঙ্গীদের সঙ্গে সংঘর্ষে আরও বেশি সেনার জীবনহানি ঘটেছে। পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গী সংগঠন গুলো ভারতীয় রাজনীতিতে অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আন্ত-সীমান্ত সন্ত্রাসেও ভারতের ভেতরে জঙ্গী সংগঠনগুলির তাণ্ডব এই দ্বিমুখী কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছে বর্তমানে। ISIS আনসার উল-ইসলাম, হিজাব-উল-মুজাহিদিন, হরকত-উল-মুজাহিদিন, লস্কর-ই-তইবা, জৈয়স-এ-মহম্মদের মতো ২৯টি জঙ্গি সংগঠন আজাদ কাশ্মীরে ঘাঁটি তৈরি করে কাশ্মীরে

নাশকতা ও হত্যাকাণ্ড চালায়। এছাড়া ভারতের অভ্যন্তরে যে তার নাশকতা হয় সব বেশ্বিরভাগই কাশ্মীর সমস্যাকে কেন্দ্র করে। ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে মার্চে মুম্বাই শহরে প্রচণ্ড ধ্বংসলীলা, ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে নভেম্বরে ভারতীয় সংসদে উগ্রপন্থী আগমন ঘটে। ২০০৮ সালে ২৬শে নভেম্বর মুম্বাইয়ে জঙ্গীরা নৃশংস হত্যালীলা চালায়। ২০১৬ সালে উরিতে হামলা হয়। এর জন্য পাকিস্তান দায়ী। বলা বাহুল্য এর যোগ্য জবার ভারত Sergical Strike-এর মাধ্যমে দিয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বর্তমান আমি চিফ জেনারেল বিপীন রাওয়াত বলেছিলেন – ভারতের সেনা বা জঙ্গী সংগঠন বন্দুকের দ্বারা তার লক্ষ্য পূরণ করতে পারবে না। এর দ্বারা কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হবে না। একমাত্র সমাধান সূত্র হল দুই দেশের আলোচনায় বসা। আসলে, জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে ভারতকে শুধুমাত্র কূটনৈতিক পথ গ্রহণ করলে চলবে না। দেশের রাজনৈতিক স্থিরতা, অর্থনৈতিক শক্তি সুনিশ্চিত করতে হবে। কাশ্মীরের হিন্দু রাজাদের বংশধর করণ সিং খুব সম্প্রতি ভারতের পার্লামেন্টেও বলেছেন যে, শর্তে তার বাবা নিজের রাজ্যকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন দিল্লি তার মর্যাদা দিতে পারেনি, ইতিহাসবিদ কিংশুক চ্যাটার্জি বলেছেন-‘ইনস্ট্রুমেন্ট অব অ্যাক্সেশনের মাধ্যমে কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু যে শর্তে হয়েছিল কালক্রমে ভারত তা থেকে অনেকটা সরে এসেছে। পাকিস্তানও কতটা জোর করেই এই অ্যারেঞ্জমেন্টের মধ্যে প্রবেশ করেছে। ফলে সাতচল্লিশে এই সমস্যার শুরু হলেও এখন সেই সমস্যা অনেক বেশি জটিল আকার নিয়েছে।’ ভারত-পাকিস্তানের মনোভাবের সারসংক্ষেপ করে ফিলডেন বলেছেন - ‘কাশ্মীর আঁকড়ে থেকে ভারত চায় দেশভাগকে দুর্বল করতে; কাশ্মীরের ওপর দাবি জানিয়ে পাকিস্তান চায় দেশভাগকে নিরাপদ করতে।’ কাশ্মীর প্রসঙ্গে উভয়পক্ষেই একেবারে অনড়। তিনি যুক্তিদেন যে, ‘অস্ত্রশাস্ত্রর পেছনে দু’দেশ যে বিপুল টাকা ঢালছে’, শেষ বিচারে কাশ্মীর সংঘর্ষ নিয়ে সেটাই হল ‘সবচেয়ে বড় কথা’। এর অর্থ, দু’ দেশেই সামাজিক পরিষেবা ভেঙে পড়ছে। আর, উদ্বাস্তু ছাড়াও দু’দেশেই যেহেতু বিশ্বের দরিদ্রতম কোটি মানুষের বাস, তাই এর ফলে যে কীভাবে সর্বনাশ ঘনিয়ে আসতে পারে কাশ্মীর সমস্যার মধ্য দিয়ে তা সহজেই অনুমেয়।’

বিজেপির পলেসি রিসার্চ গ্রুপের নেতা অনির্বণ গাঙ্গুলি বলেছিলেন যে – ‘আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বা আজাদির কথা যারা বলেন তারা খুবই মুষ্টিমেয় লোক। বাইরের মদতে তারা এমন একখানা ভাবে তৈরি করেন যে দুনিয়া ভাবে কাশ্মীরে বোধহয় তোলপাড় চলছে। কিন্তু আসলে পরিস্থিতি মোটেও তা নয়। সেখানকার অধিকাংশ মানুষ মনেপ্রাণে জানেন ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে থাকলেই তাদের মঙ্গল। শিক্ষা-চাকরিবাকরি উন্নতির সুযোগ তাঁদের ভারতেই অনেক বেশি।” তিনি আরও বলেছেন যে -১৯৪৭-এর যুদ্ধে ভারত যদি যুদ্ধবিরতি না মেনে অভিযান চালিয়ে যেত এবং বিষয়টাকে রাষ্ট্রসংঘ অবদি না গড়াতে দিত তাহলে কাশ্মীর সমস্যা কিছুতেই এতো দূর আসতো না।

কাশ্মীরের সমস্যার সমাধানে যে সকল পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে তা হল

১) একটি কার্যকরী পরিষদ গঠন করে তার অধীন কাশ্মীরের জনগনকে একতাবদ্ধ করা।

২) সেই কার্যকরী পরিষদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মঞ্চে কাশ্মীরীদের শক্তিশালী প্রতিনিধিত্ব সৃষ্টি করা।

৩) কাশ্মীরের বাসিন্দাদের শিক্ষা ও প্রাথমিক চাহিদাপূরণে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহে ও তার ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্রসংঘের সাথে একযোগে কাজ করার উদ্যোগ গ্রহন করা।

৪) কাশ্মীরের সমস্যার সহজ সমাধান হতে পারে গণভোটের মাধ্যমে কাশ্মীরের জনতার রায় জানতে চাওয়া এবং রায় মোতাবেক কাশ্মীরকে তার আজাদির পথে হাঁটতে দেওয়া।

৫) কাশ্মীরসমস্যা সমাধানে উভয় দেশের সরকার (ভারত ও পাকিস্তান) যাতে বাধ্য হয়, সেজন্য প্রচলিত বৈধ পন্থায় আন্তর্জাতিক আইন মেনে সামরিক-বেসামরিক আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া।

৬) ভারত-পাকিস্তান উভয়কেই কাশ্মীরকে টোপ হিসেবে ব্যবহার না করার অঙ্গীকার করা।

৭) আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে ভারত-পাকিস্তানের উপর চাপ সৃষ্টি করা, যাতে করে উভয় দেশের সরকার বার্তালাপের মাধ্যমে সীমান্তে হত্যাকাণ্ড দূর করতে পারে।

সর্বোপরি ভারত-পাকিস্তানের ফলপ্রসূ আলোচনাই হতে পারে এ সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ।

কিন্তু সাম্প্রতিককালে কাশ্মীর সমস্যাকে নিয়ে ভারত বনাম পাকিস্তান, যুদ্ধ বনাম বার্তালাপ, হিন্দু বনাম মুসলমান, কাশ্মীর বনাম ইসলাম, জম্মু বনাম হিন্দু পাথর বনাম AK47 সংঘাতে কাশ্মীর সংকট যে প্রতিনিয়ত জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে এবং বিশ্বের অন্যান্য সংকটকে উসকানি দিচ্ছে তাতে কোনো সংশয় নেই।

শিক্ষক দিবস

রাকেশ হালদার
বি.এ. ১ম বর্ষ, ইতিহাস বিভাগ

৫ই সেপ্টেম্বর
শিক্ষক দিবস।
ওই দিনেতে জন্ম তোমার,
শিক্ষাগুরু বলে জানি।
৫ই সেপ্টেম্বর
ওই দিনটিকে আমরা সবাই
শিক্ষক দিবস বলে পালন করি।
প্রথম উপরাষ্ট্রপতি তুমি,
ছিলে জনপ্রিয় দার্শনিক।
জন্মেছিলেন ৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৮৮ সালে তামিলনাড়ুতে
মানুষ তুমি মানবিক।
সকলের শিক্ষক তুমি,
সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ নাম।
জন্মদিনে জানাই তোমায়,
আমার শত কোটি প্রণাম।

নতুন জীবন

প্রিয়া মণ্ডল
বি.এ. ২য় বর্ষ, দর্শন বিভাগ

দেখ চেয়ে একবার অসীম রহস্যময়
অনন্দ এ বিশ্ব
দেখা সেথা কিবা গায় কোন কথা বলে তোর
প্রতি নব দৃশ্য।...
প্রতিদিন ফুল ফুটে প্রতিদিন ঝরে তারা
ফোটে নব ফুল।
রবি অস্তাচলে যায় নতুন তপন আনে
আলোক অতুল
একটি বিহঙ্গগীত চিরতরে থেমে যায়
শত পাখি গায়,
একটি বসন্ত যায়, আবার দক্ষিণে ছুটে
বসন্ত বায়।
একটি তারকা খসে আকাশের শতকরা
ঢালে জ্যোতি হাসি
একটি জাহ্নবী ঢেউ সাগরে মিলায়ে যায়
আপনা বিনাশি
হিমগিরি হতে পুন তটিনী বহিয়া আনে
নতুন জীবন
বিরহের গীতখানি না হইতে অবসান
গাহে রে মিলন।

বিজ্ঞান ও ধর্ম

কৃষ্ণকান্তি হালদার
শিক্ষাকর্মী

পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাত সম্প্রদায় ও বিভিন্ন রকমের রিলিজিয়ন বা ধর্ম প্রচলিত রয়েছে। এই ধর্ম নিয়ে সমগ্র বিশ্ব বিভ্রান্ত। নিজের ধর্মকে কেউ অপরের ধর্ম থেকে ছোট হতে দেয় না। আমরা সবাই মনে করি আমি যে ধর্ম লালন করি সেই ধর্মই হচ্ছে পৃথিবীর সব থেকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম। বিশ্ব শান্তির পথে সবথেকে বড় বাধক এই ধর্ম। আমরা যদি প্রাচীন ইতিহাসের পাতা একটু উল্টিয়ে দেখি তাহলে দেখা যাবে সেখানে অনেক বড় বড় ধর্মযুদ্ধের কথা উল্লেখ আছে, অনেক প্রাণহানি হয়েছে এবং এই সুন্দর পৃথিবীর অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু ধর্ম প্রকৃত অর্থে কী ? কেন আমরা এই নিয়ে একে অপরের সঙ্গে ঝগড়া মারামারি করছি তা আমরা বুঝে উঠতে পারিনি। এই ধর্ম নিয়ে আমাদের পূর্বপুরুষেরা বিভ্রান্ত রয়েছি। তাই আমাদের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করতে হবে ধর্ম প্রকৃত অর্থে কী ? এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এর বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন।

ধর্ম প্রকৃত অর্থে কী ? আমরা যদি বিজ্ঞানসম্মত ভাবে এর বিচার করি তাহলে দেখা যাবে 'রসায়ন বিজ্ঞানে' ধর্ম শব্দটি বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানে রয়েছে বিভিন্ন পদার্থের ভৌত ধর্ম ও রাসায়নিক ধর্মের বিশ্লেষণ। যেমন- আগুনের ধর্ম, পারদের ধর্ম, কিন্তু এই সব ধর্ম পারদ ও আগুনের রিলিজিয়ন বোঝায় ন। বোঝায় এই সব পদার্থের অবিচ্ছেদ্য মূলগত বৈশিষ্ট্য। যা থেকে পদার্থকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। জোর করে করলে পদার্থ তার নিজস্ব স্বরূপ হারাবে। যেমন - আগুনের ধর্ম তাপ, আলোক বিতরন করা, জলের ধর্ম স্বচ্ছতা ও তরলতা, পাথরের ধর্ম কাঠিন্য, বরফের ধর্ম শীতলতা। যেমন - চিনি মিষ্টি, লবন নোনতা, লঙ্কা ঝাল, -এইসব বস্তুকে তাদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। বৈদিক অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে ঠিক এই অর্থে ধর্ম শব্দটির প্রয়োগ এই ধর্ম কোন জাতিগত বা সম্প্রদায়গত ধর্ম নয়। পৃথিবীর তেমনি সজীব বা (অ-জড়) - 'চেতন কনিকা চিদ্ বস্তু কনিকা স্পিরিটন। সংস্কৃত ভাষায় যাকে বলা হয় আত্মা (SOUL SPIRIT SELF) যেটি না থাকলে বিশ্বের প্রতিটি জীবদেহ জড়পিন্ড -এর মত আচরণ করে। কিন্তু এই আত্মারও নিজস্ব স্বরূপগত বা স্বভাবগত অবিচ্ছেদ্য গুণ রয়েছে। এটি একটি বিজ্ঞানসম্মত তথ্য, কোন মতবাদ নয়। প্রতিটি বস্তুর অন্তর্নিহিত গুণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং থাকবেই। সে জড় বস্তু বা অজড় বস্তু হোক না কেন। ইলেকট্রনের যেমন নির্দিষ্ট আয়তন, ওজন বা আবর্তন গতি ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য রয়েছে তেমনি আত্মারও নির্দিষ্ট আকার আয়তন রয়েছে। শাস্ত্রীয় মতে আত্মার আয়তন হচ্ছে একটি চুলের অগ্রভাগকে ১০০০০ ভাগ করলে একটি ভাগের সমান।

এই আত্মা বা স্পিরিটন অবিনশ্বর। আত্মার বিনাশ হয় না। আত্মাকে আগুনে পোড়ানো যায় না, ধারালো অস্ত্র দিয়ে কাটাও যায় না। যেমন পদার্থ থেকে ছেদ করা যায় না ইলেকট্রন, প্রোটন বা নিউট্রন কে।

আমরা যেমন ইলেকট্রন স্রোতকে ব্যবহার করে রোবট, কম্পিউটার, ফ্রিজ, এসি ইত্যাদি চালানোর কাজে এবং বাল্ব জ্বালানোর কাজে ব্যবহার করি ঠিক সেইরকম চেতন বস্তু বা আত্মা লক্ষ লক্ষ প্রজাতির দেহ যন্ত্রগুলোকে সচল বা সক্রিয় রাখে, আমাদের বৈদিক শাস্ত্রে বলেছে -

'যন্ত্র আঢুরী মায়া ব্রহ্ম সর্ব ভুতানী'।

-এর অর্থ,আমাদের দেহখানি একটি যন্ত্রের মত। এই মানব রূপী যন্ত্রে আত্মা প্রবেশ করে সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করে। কিন্তু আমাদের জানতে হবে এই দেহ যন্ত্রটি জড় উপাদান দিয়ে তৈরী। (কার্বন, ক্যালসিয়াম, ফসফেট, জল) - ইত্যাদি। শাস্ত্র মতে বলে পঞ্চমহাভূত। (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম)। কিন্তু এই জড় উপাদানগুলোর নিজস্ব কোন ব্যক্তিত্ব নেই। কিন্তু আত্মা বা (স্মিরিটনের) নিজের কিছু স্বভাবধর্ম রয়েছে। সেগুলো কী - আমাদের জানতে হবে।

১. সেবা - আমরা প্রত্যেকেই একে আপরের সেবা করে থাকি। যেমন - পিতামাতা সন্তানের সেবা করে। সন্তান পিতামাতার এবং বন্ধু-বান্ধব, অফিস কর্মী এবং গোষ্ঠী

নেতারা জনগণের সেবা করে।

২. **ভালোবাসা** - এই চেতন জীব আত্মা একে অপরকে ভালোবাসবেই। জীব অনিত্য কিন্তু ভালোবাসা নিত্য। জীব মারা যায় কিন্তু এই ভালোবাসা কোন দিন মরে না। পরবর্তী যে জীব জন্মগ্রহণ করে সে ভগবানের কৃপাতে সেই ভালোবাসা লাভ করে। এই ভালোবাসা পাঁচ প্রকার। - শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর। মানুষ সহ নিম্নতর প্রজাতির মধ্যে বিভিন্নভাবে এই সব ভালোবাসার অভিব্যক্তি হয়। আবার কোন কোন মানব আত্মার ভালোবাসা দেশ ছাড়িয়ে বিশ্ব মানবতা এবং তারপর সর্ব জীব ও সকল উৎস পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অভিব্যক্তি হয়। তাদেরকে আমরা মহাপুরুষ বলি।

৩. **আনন্দ তৃষ্ণা** - এই পৃথিবীতে প্রত্যেক চিৎ পরমানু বা আত্মার ধর্ম হচ্ছে যে সে সর্বদা আনন্দে থাকতে চায় সেই জন্য পৃথিবীর সবথেকে বেশি অর্থ ব্যয় হয় বিভিন্ন প্রকার বিনোদনে।

কিন্তু সব থেকে বড় প্রশ্ন হচ্ছে এই আত্মা জড় পরিবেশে বা জড় জগতে পতিত হলে আত্মার শুদ্ধ চেতনা আচ্ছাদিত হয়। তখন তাঁর স্বভাব প্রকাশিত হয় বিকৃত রূপে। এই জড় জগৎ চিন্ময় আত্মার স্বাভাবিক পরিবেশ নয়। যেমন সূর্যের কিরণ যখন পাহাড়, পর্বত, বন, জঙ্গল, নদ-নদী, কিরণ রশ্মির উৎস নয়, উৎস নিত্য জ্যোতিস্থান সূর্য। তেমনি আমাদের এই উৎস হচ্ছে ভগবদ্ ধাম। আত্মা এই জড় পরিবেশে পতিত হলে জড় গুণে (সত্ত্ব, রজ, তম) মানে সাত্ত্বিক, রাজসিক, আর তামসিক গুণে কালুষিত হয়ে পড়ে। ফলে স্বভাবে প্রকাশ পেতে থাকে বিকৃত রূপ।

১. সেবা পরিবর্তিত হয় প্রভুত্ব আকাঙ্ক্ষায়। তাই জগতে প্রত্যেক জীব অন্য জীবের উপরে প্রভুত্ব করতে চায়।

২. ভালোবাসা পরিবর্তিত হয় বিকৃত কাম ও স্বার্থপরতায়।

৩. শুদ্ধ ভগবৎ প্রেম পরিবর্তিত হয় আনন্দ উল্লাস বিকৃত আমোদপ্রমোদে বিকৃত রুচির সহিত, আর বিভিন্ন ধরনের নেশা মাদকতায়। আমরা চোখের সামনে দেখছি এখনকার যুগে যেসব পূজা অর্চনা আমরা করি তার মধ্যে কোন ভক্তি শ্রদ্ধা একদম নেই। আছে শুধু হিংসা প্রতিহিংসা। কে কত বড় প্রতিমা তৈরী করতে পারে, কে কেমন আলোক সজ্জা করতে পারে, কার বাজেট কত বেশি এইসব।

আমরা যদি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে চিন্তা করি তাহলে দেখা যাবে ইলেকট্রন পরমানুর অংশ। পরমানু থেকে ইলেকট্রনকে বিচ্ছিন্ন করলে সে তার উৎসে ফিরে যেতে চায়। আর তৈরী হয় বৈদ্যুতিক প্রবাহ। এই নিয়মের ভিত্তিতে চালিত হয় ইলেকট্রনিক যন্ত্রগুলি।

সেই রকম আত্মা পরম ব্রহ্ম, পরমেশ্বর ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন মম-এব-অংশ জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। ভগবান বলেছেন সমস্ত জীব আমার অংশ, আমি সমস্ত জীবের মধ্যে বিরাজমান। আত্মা রূপে সেই আত্মাকে আমিই নিয়ন্ত্রণ করি। সেই জন্য পরমাত্মা জীবের সঙ্গে ভগবানের এই সম্পর্ক ছিন্ন হবার নয়।

আমাদের এই সুন্দর মানব শরীর তিনটি প্রধান অংশ নিয়ে তৈরী।

১. স্থূল শরীর। যে শরীরটি হাড়, মাংস, রক্ত, কফ, মল, মূত্র দিয়ে তৈরী। মৃত্যুর পর যাকে নিয়ে আমরা শোক পালন করি তার পরে ধর্মানুসারে তার অন্তিম সংস্কার করি।

২. এই স্থূল শরীরের মধ্যে থাকে সূক্ষ্ম শরীর– মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার।

৩. আর এই সূক্ষ্ম শরীরের মধ্যে থাকে অতি সূক্ষ্ম শরীর সৎচিৎ আনন্দ বা আত্মা।

এই আত্মার মৃত্যু হয় না। আমরা যেমন পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করি সেইরূপ আত্মা পুরাতন জরাজীর্ণ রোগ ব্যাধি যুক্ত দেহ ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করে। যতদিন সৎ চিৎ আনন্দ বা আত্মা আমাদের ভিতরে আছে ততদিন আমাদের মূল্য আছে। যখন তিনি নেই তখন এই শরীরের আর কোন মূল্য নেই। তখন শরীর জড় পদার্থ। যে দেহ নিয়ে আমাদের এত অহংকার তার কিন্তু অন্তিম তিনটে পরিণতি।

১. ছাই, ২. মল মূত্র বিষ্ঠা, ৩. পোকামাকড়।

মানে আমি যদি হিন্দু ধর্ম লালন করি আমাকে চিতায় জ্বালিয়ে দেবে। সুন্দর দেহটি ছাই হয়ে যাবে। আমি যদি মুসলমান বা খ্রিষ্টান হই আমাকে মাটিতে পুতে দেওয়া হবে। তখন এই সুন্দর দেহটিকে পোকা মাকড়ে খেয়ে খেয়ে শেষ করে দেবে। আবার কোনো কোনো সম্প্রদায় শবদেহকে নদী বা গঙ্গায় ভাসিয়ে দেয় তখন দেহটি কুকুর, শেয়াল, শকুন, কাক প্রভৃতিরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে আর মল মূত্র করে শেষ করে দেবে। তাহলে এই দেহ নিয়ে কিসের এত অহংকার।

আমি যদি আপনাকে প্রশ্ন করি আপনি কে? কি বলবেন? নিজের নাম। পিতা বা মাতার নাম বা কর্ম সংস্থানের নাম বা গ্রাম বা শহরের নাম কিন্তু এটি আপনার সঠিক পরিচয় নয়। আমি যদি আপনাকে আপনার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করি আপনি হয়তো বললেন ঐ যে বাড়ির উপরে একটি কাক বসে আছে এটি আমার বাড়ি। এটি কিন্তু সঠিক ঠিকানা নয়। কারণ বাড়িটি স্থির। আর কাকটি অস্থির। কাকটি কিছুক্ষণ পর অন্য একটি বাড়িতে গিয়ে বসবে। আমি কে? এর সঠিক উত্তর হল নিত্যাস্থির বস্তুর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক। তাহলে এই জগতে নিত্য স্থির বস্তু কে? পরমেশ্বর ভগবান। তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ আমাদের সঠিক পরিচয়। তাই কলির অবতার চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন - জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ।

মানে আমরা ভগবানের মাঝের শক্তি। কিন্তু আমরা এই জগতে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নিজের স্বরূপ হারিয়ে ফেলেছি। একটি গল্প মনে পড়ছে -

একটি গভীর জঙ্গলে একটি বাঘিনী বাস করত। বাঘিনীটি ছিল গর্ভবতী। বাঘিনীর যখন গর্ভপাতের সময় হল সে গর্ভযন্ত্রণায় ছটফট্ করতে করতে একটি গর্তের মধ্যে পড়ে গেল। তখন সে একটি সুন্দর বাচ্চার জন্ম দিল। কিন্তু দৈববশে তখনি তার মৃত্যু হল। নবজাত বাচ্চাটি ভূমিষ্ট হবার পর কাঁদতে লাগল। কিন্তু মা তো মৃত। এইভাবে সে কান্নাকাটি করছে। এমন সময় একটি হরিণের পাল সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় একটি হরিনী সেই নবজাত বাঘের বাচ্চাটির কান্না শুনতে পেল। কথায় বলে মায়ের মন। হরিনী ঠিক থাকতে না পেরে বাঘের বাচ্চাটি উদ্ধার করে লালন পালন করতে লাগল। এইভাবে বাঘের বাচ্চাটি হরিণের পালের সঙ্গে বড় হতে লাগল। হরিনের মত আচরণ করে, হরিণের মত ঘাস খেয়ে, এইভাবে দিন অতিবাহিত হতে লাগল। কালচক্রে অন্য একটি জঙ্গল থেকে একটি বাঘ এসে একদিন সেই হরিণের পালের উপর আক্রমন করল। প্রাণের ভয়ে হরিণগুলো পালাতে লাগল। সেই সঙ্গে সেই বাচ্চাটিও পালাতে লাগল। এইভাবে ছুটতে ছুটতে সেই শিকারী বাঘটির নজরে আসল হরিণের সঙ্গে সঙ্গে একটি বাঘ ও পালাচ্ছে। দেখে সে আশ্চর্য হয়ে গেল, একি আমাকে দেখে এই বাঘটি পালাচ্ছে কেন – আমিও বাঘ সেও বাঘ। এর কারণ আমাকে জানতে হবে।

এই বলে সে হরিণগুলোকে ছেড়ে দিয়ে বাঘটিকে গিয়ে ধরল। তাকে দেখে বাঘটি তো ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। তখন সেই শিকারী বাঘটি বলছে এ ভাই তুই আমাকে দেখে ভয়ে পালাচ্ছিস কেন? তখন বাচ্চা বাঘটি বলছে - তুমি আমাকে খেয়ে ফেলবে বলে। শিকারী বাঘটি তখন বলছে, এই বোকা তোকে আমি খাব কেন? তুইও বাঘ, আমিও বাঘ। বাঘ কোনদিন বাঘের মাংস খায় নাকি। তখন বাচ্চা বাঘটি বলে যে, না আমি বাঘ নই আমি হরিণ। তুমি আমাকে খেয়ে ফেলবে। সে কিছুতে মানতে চায় না যে সে বাঘ, তখন সেই শিকারী বাঘটি বুঝতে পারল হরিণের সাথে মিশে মিশে সে নিজের স্বরূপ হারিয়ে ফেলেছে। সেই জন্যে নিজেকে হরিণ মনে করছে। তাহলে এখন যে কোন উপায়ে একে নিজের স্বরূপ অবগত করাতে হবে। তাই বলে তাকে সঙ্গে করে একটি স্বচ্ছ জলাশয়ের ধারে নিয়ে বলল দেখ ভালো করে তুই আর আমি এক। তুইও বাঘ, আমিও বাঘ। তুই হরিণের সঙ্গে বেড়াচ্ছিস কেন? ওরা আমাদের খাদ্য। আমাদের কাজ ওদের শিকার করা। এই বলে সেই শিকারী বাঘটি গর্জন করে উঠল। তাই দেখে সেই বাঘটিও ভয়ঙ্কর গর্জন করে উঠল। এবং নিজের স্বরূপ ফিরে পেল।

ঠিক সেইরকম আমরা সবাই মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নিজের স্বরূপ হারিয়ে ফেলেছি। হারিয়ে ফেলেছি

মনুষ্যত্ব বোধ, আচরণ করছি পশুর থেকে অধম। ধর্মের সঠিক অর্থ না জেনে করছি ধর্মযুদ্ধ। আর এই সুন্দর পৃথিবীকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছি।

আমি এই প্রবন্ধে বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের যে সম্বন্ধ তাই একটু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলাম। অন্য কোন ধর্ম বা সম্প্রদায়কে ছোট করবার উদ্দেশ্য আমার নয়। সকল ধর্মের সার কথা একই।

১. পরমেশ্বর ভগবান সবকিছুর পরম উৎস পরম নিয়ন্তা।

২. ভগবান এক ও অদ্বিতীয়। সকল জীবের নিত্য পরম পিতা।

৩. ভগবৎ প্রণীত আইন (ধর্ম) মেনে চলা কর্তব্য।

৪. সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য ভগবানকে ভালোবাসা ভগবৎ প্রেম।

৫. সকল কর্মের উদ্দেশ্য ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান।

৬. পাপকর্ম না করা, ত্যাগ ও বৈরাগ্যের অনুশীলন।

৭. আত্মা অজড়, অমর, অবিনশ্বর।

৮. তত্ত্বদর্শী সদ্‌গুরু গ্রহণ।

৯. জীবনের উদ্দেশ্য ভগবদধামে ফিরে যাওয়া।

১০. ভগবানের দিব্যনামের অনবদ্য মহিমা প্রচার।।

স্বপ্ন পূরণের দেশে

আদুরী বিশ্বাস

বি.এ. তৃতীয় বর্ষ, বাংলা বিভাগ

সুধীরবাবু কেতাবপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের বাংলার একজন শিক্ষক। সে এখন জীবনের প্রান্তসীমায় এসে পড়েছে। তাই সুধীরবাবুকে এখন তার কর্ম জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করতে হবে। এখন সুধীরবাবুর জীবনের অন্তিম লগ্নে এসে ইচ্ছে হয়েছে বিশ্বরেকর্ড গড়ার। তাই তিনি জানা ও অজানার মেলবন্ধন ঘটাতে স্বপ্ন বুনলেন সে বিশ্বরেকর্ড গড়বে। কিন্তু সুধীরবাবু কিছুতেই ভেবে পাচ্ছে না কি করে সে বিশ্বরেকর্ড গড়বে। এবার তার সাধ জাগল কবিতা লিখে সে বিশ্বরেকর্ডের নজির গড়বে। কিন্তু তার আগেই তো রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ, মাইকেল লিখে গেছেন তাই সে ডাইরির পাতা থেকে তার কবিতা গুলো ছিঁড়ে ফেলল, সে ভাবল কবিতা লিখে সে আর বিশ্বরেকর্ড করতে পারবে না। এবার সে ছবি আঁকতে বসল ভাবল ছবি এঁকে সে বিশ্বরেকর্ড গড়বে। কিছু আঁকার পর সে ভাবল আমি এই বয়সে এসে ছবি এঁকে কিভাবে বিশ্বরেকর্ড গড়ব? আমার আগে তো যামিনী রায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছবি এঁকে নজির গড়ে গেছেন তাই সে রঙ তুলি সব ছুড়ে ফেলে দিল। কিছুদিন পর সুধীরবাবু ঘরে শুয়ে আছে। শরীর আগের থেকে আরো খারাপ হয়ে গেছে। এমন সময় সুধীরবাবুকে একজন মাষ্টার মশাই বলে ডাকছে। সুধীরবাবু শীর্ণ কণ্ঠে বলছে কে কে? সে তখন বলল মাষ্টারমশাই আমি আপনার ছাত্র। আমি এখন ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে বাংলা ভাষাতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করছি ও ছাত্রদের শেখাচ্ছি। সুধীরবাবুর শরীর প্রবোধের কথায় বিদ্যুতের গতিতে ভালো হয়ে যায় তখন সে ভাবে এতক্ষণ সে কি আজে বাজে চিন্তা করছিল। তখন সুধীরবাবু আবার পুরোনো পেশায় ফিরে গিয়ে শিক্ষকতার কাজ শুরু করে। কারণ সুধীরবাবু আরো হাজার হাজার প্রবোধ সৃষ্টি করতে চায়। কেননা সমাজে যারা শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করে তাঁরা সমাজের উৎকৃষ্ট ব্যক্তি।।

ব্যর্থ পাখি

সুমন মণ্ডল
বি.এ. তৃতীয় বর্ষ, বাংলা বিভাগ

সব আছে তার
দুটি পা, দুটি চোখ, সুন্দর সুন্দর দুটি ডানা
কিন্তু সে উড়তে পারে না
কেন পারে না?
তবে কি তার ফুসফুস আজ স্ট্রাইক করল?
না, তার ফুসফুস স্ট্রাইক করেনি
তার নাক - কান - চোখ কোন অঙ্গই স্ট্রাইক করেনি।
সে দেখছে নীল আকাশ প্রস্ফুটিত মেঘ নিয়ে
তার জন্য অপেক্ষা করছে।
সে দেখছে দূরে ওই শস্যক্ষেতে তার জন্য দানা পড়ে আছে।
সে শুনছে চারিদিকে আজ উৎসবের রোল উঠেছে
যাতে ম্লান করে দিচ্ছে তার বাচ্চাদের আর্তনাদ।
তারা উড়তে শেখেনি।
বাসায় বসে পেটের শূন্যতায় খালি আর্তনাদ করে চলেছে।
আর তাদের মা ওইখানে বসে থেকে ভুলে যায়
নিজের কথা, বাচ্চাদের কথা, তাদের ডানার কথা।
সে শুধু দেখে, আর শোনে, আর ঘ্রাণ পায়।
কিন্তু সে কিসের ঘ্রাণ পায়?
সে তো দেখছে আর শুনছে।
শুনছে জয়ের ধ্বনি, প্রতিবাদের, বিদ্রোহের।
দেখছে সুসজ্জিত মিছিল, আছে বাজনা, আছে শ্লোগান,
সকলের হাতে নিশান আছে,
কিন্তু একটিও তিরঙ্গা নেই।
সে ভাবে আর ঘ্রাণ পায়, ঘ্রাণ পায় আর ভাবে।
আর ফোঁটা ফোঁটা জলবিন্দুর খরস্রোতে সব ভাসিয়ে দিতে চায়।

দাঙ্গাবাজ

জাহির মণ্ডল
বি.এ. তৃতীয় বর্ষ, ইতিহাস বিভাগ

সারাদেশে উঠেছে একরব,
হিন্দু মুসলিম করছে কল রব।
যে যার মাথায় মারছে যে, লাঠি,
সন্দেহ হয়, ওরা ধর্মে কতটা খাঁটি?
একজনেতে ভাঙছে মূর্তির মাথা,
আর কতজনে ভাঙছে মসজিদের ছাতা।
এমন করে, যে যাই ভাঙো,
তাতে কী আর সমাধান পাব?
'আমার ধর্ম শ্রেষ্ঠ' বলে
আর একজনকে দিচ্ছি ফেলে।
এটা যে কোন ধর্মে বলে?
খুঁজছি আমি সেকাল থেকে।
যে, নিজের ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে।
অন্য ভাইয়ের রক্ত নেবে।
দাঙ্গা আমরা নাই বা করি,
একে অন্য ভারতবাসীকে ভালোবাসি।
ভারতবাসী আমারা একে অপরের ভাই ভাই।
এটা বলতে আমাদের লজ্জা নেই।
হিন্দু-মুসলমান শুধু তাদের সাজ
দাঙ্গাকারীদের একটাই ধর্ম তারা দাঙ্গাবাজ।।

এক গুচ্ছ কবিতা

মুজাহিদ সেখ
বি.এ. দ্বিতীয় বর্ষ, সাম্মানিক বাংলা

প্রতীক্ষা

তারপর! পরবর্তী প্লটের প্রতীক্ষায়
তখনও মিলন হয়নি দুজনের
ভালোর চাইতে বাজে কথা ঢের বেশি
সিগারেটের ধোঁয়া ও পুস্তকের আবিষ্ট গন্ধে
তবুও মন চাই শেষ করতে।

নায়কের রেপিউটে গলে যায় তার মন
সোহাগ, সৌহার্দে দিনযাপন
সেমিনারের ডাকে নায়কের দূঢ় দেশে গমন
হঠাৎই মহাপতন।
ওয়াশিংমেশিনে গিয়ে ধুয়ে ফেলে
মিলনের দাগ
শেষ রোদের ছাঁয়ায়, বাতাসে উঠে যায়
তার ভালোবাসা।।

নব পরিষদ

হায়রে রাজধানী কায়া
তোর অঙ্গে অঙ্গে লাগালো কেন দ্বৈরথ?
সেদিনের বাস ছিল মিলেমিশে
পক্ষপাতিত্ব ছিল না, ছিল সমান অধিকার

আজ সহযোগিতা ও সহানুভূতির অভাব।
গলির সহযোগিতা ও সহানুভূতির অভাব।
গলির মোড়ে সামঞ্জস্যের পতন।
তোর কল্যাণমূলক আদর্শ, চিন্তা, তত্ত্ব
গিয়েছে ঘুচে।

আবার দাঁড়া গর্জে ওঠ অভিনবত্বের খোঁজে
শিক্ষা - সংস্কৃতি আর ভালোবাসার
বিচিত্রতায় জেগে ওঠ নব পরিষদে।।

উপেক্ষিত শিশু

একটি নিস্তব্ধ নিশুতি রাত
জানা নেই তার আলফাবেট
কিন্তু কেন জানি না, সে পড়তে চায়
প্যারাডাইজ লস্ট
স্কট, কীটস্, কোলরিজ হবার স্বপ্ন তার
মায়াবী আলোয় আলোকিত হতে চায় সে
সর্বক্ষণের বৈষম্য তার অজানা
তবুও প্রত্যাশার খামতি তার মধ্যে নেই।

নবজাত শিশুটি বুক চিতিয়ে পড়ে থাকে স্টেশনে
আধমরা হয়ে কাটাতে হয় নিত্যদিন
নিয়তিকে নাড়িয়ে দেখার ক্ষমতা তার নেই
ভেঙে যায় তার মন
দাওয়ায় বসে, মায়ের কোলে মাথা রেখে
তার আর উপন্যাস পড়া হলো না।।

এক গুচ্ছ কবিতা

মৌমিতা হালদার
বাংলা বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ

অঙ্গীকারে আবদ্ধ

অভিমানে তার দিনকতক গেল,
এই আকাশ ছেড়ে অন্য আকাশের নীচে
আর এই বাতাস ছেড়ে অন্য বাতাসের গন্ধে,
আর ছেড়ে যেতে হবে তার ঘর, তার মা-বাবাকে
তাই সে অভিমানিনী।
সৃষ্টিকর্তার আশিষ আর পালনকর্তার বর নিয়ে
ইতিলগ্নে নববধূরূপে তার গৃহপ্রবেশ,
এ জীবনের মানে বোঝেনি অবুজ মন।
তাই তুমি আমাদের সৃষ্টিসীমার বাইরে হতে পারো
কিন্তু আমাদের হৃদয় থেকে দূরে নয়।
তুমি আমাদের নাগালের বাইরে যেতে পারো,
কিন্তু আমাদের মন থেকে নয়।
অন্য দেওয়াল গেঁথে আমার কাছে না থাকতে পারো
তবু আমিই তোমার জীবনের সবকিছু হয়ে থাকবো।।

অচেনা পৃথিবী

প্রকৃতিটা আজ বিশ্বখাতায়;
হিসাব মেলে না বৃক্ষপাতায়।
জগৎ যেন মানব ছলে;
সকল বাক্য বানিয়ে বলে।
বিষে বিষাক্ত এই পৃথিবী;
আজ সকল ভালোই মিথ্যা স্মৃতি।
সত্য যেন বন্ধ খাঁচায়;
সোনার সম্মান ধুলোয় লুটায়।
সর্বশান্ত এই পরিবেশ;
ধরে থাকে শুধু ছদ্মবেশ।
সততা ভরা এই স্বদেশ
যেন এক নিমেষে সর্বশেষ।।

লেখা

লেখা মানে লিখতে হবে;
থাকবে মনের ভাব।
লেখা মানে শুদ্ধ ভাষার;
থাকবে না অভাব।।
লেখা মানে বিশ্বজয়ীর
এক অপূর্ব ক্ষেত।
লেখা মানে তোমার আমার
মিলনের সংকেত।।
লেখা মানে জগৎটাকে
আনবে নিজের সাজে।
লেখা মানে বিলিয়ে দেওয়া
নিজেকে সবার মাঝে।
লেখা মানে থাকবে স্মৃতি
জগতের রীতিনীতি।
লেখা মানে সব বিপদের;
থাকবে শুধু ইতি।।

অঙ্কন বিভাগ

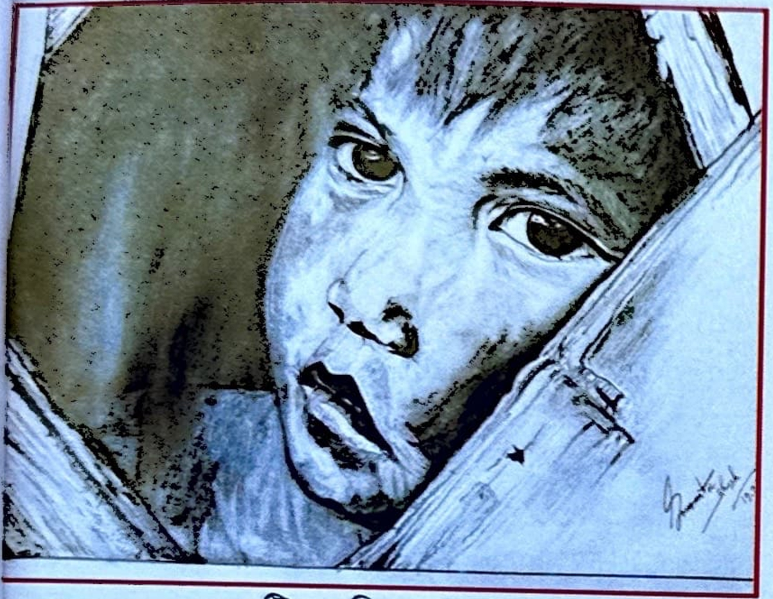

দৃষ্টি - সুস্মিতা ঘোষ

ঐক্য - শুভ বিশ্বাস

Black & lovely - বৃষ্টি বিশ্বাস

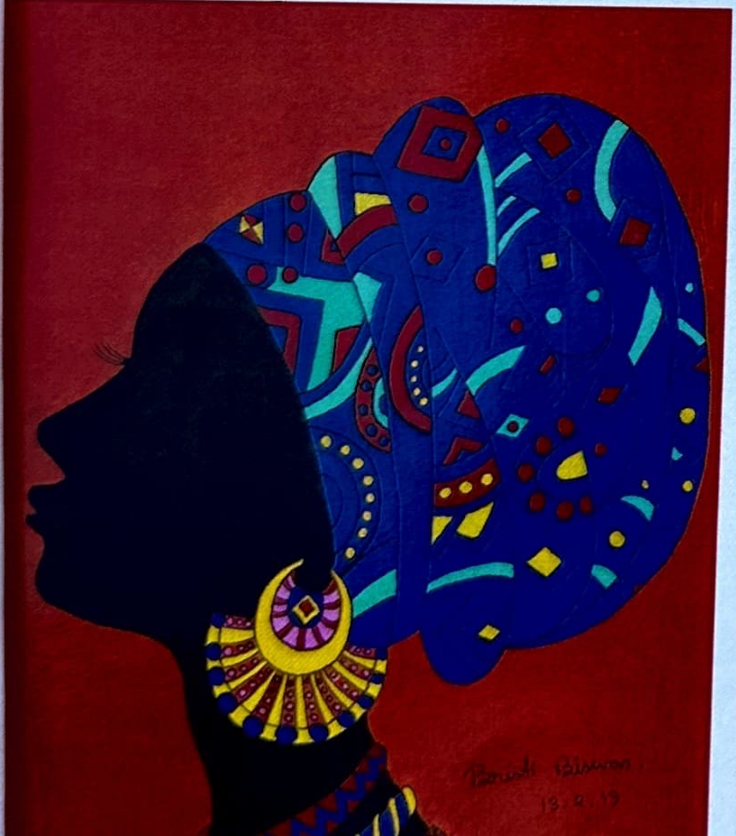

রামসীতা - অনিন্দিতা বিশ্বাস

তেহট্ট সরকারি মহাবিদ্যালয়

ধনধান্য

বার্ষিক পত্রিকা ২০১৮-২০১৯

তেহট্ট সরকারি মহাবিদ্যালয়
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. শিবশংকর পাল কর্তৃক তেহট্ট সরকারি মহাবিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত
মুদ্রণে : সুপার কম্পিউটার (ডিজিটাল) প্রিন্টার্স, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।